এ ছাড়া পৃথিবীর অপর সুসংবাদ হল এই যে, সাধারণ মুসলমান কোন রকম স্বার্থপরতা ব্যতিরেকে তাকে ভালবাসে এবং ভাল মনে করে। এ ব্যাপারে রসূলে-করীম (সা) বলেছেন ঃ تلك عاجل بشرى المؤمنين অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের ভাল মনে করা এবং প্রশংসা করা অপর মু'মিনের একটি নগদ সুসংবাদ। —(মুসলিম ও বগবী।)

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ۝ أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

(৬৫) আর তাদের কথায় দুঃখ নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্‌র। তিনিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (৬৬) শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র। আর এরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে—তা আসলে কিছুই নয়; এরা নিজেরই কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনাকে যেন তাদের কথায় দুঃখিত না করে (অর্থাৎ আপনি তাদের কুফরী কার্যকলাপে দুঃখিত হবেন না। কারণ, জ্ঞান এবং উল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও)। সমস্ত বিজয় (ও ক্ষমতাও) শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য (নির্ধারিত। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনার হিফাযত করবেন)। তিনি (তাদের কথা) শোনেন (এবং তাদের অবস্থা) জানেন, (তিনি তাদের কাছ থেকে আপনার প্রতিশোধ নিজেই নিয়ে নেবেন) মনে রেখো যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতা, জিন ও মানব) এসবই আল্লাহ্‌র (মালিকানাভুক্ত)। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা নির্ধারিত বিধানকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (সুতরাং সর্বদিক দিয়ে আপনার আশ্বস্ত থাকা উচিত) আর (যদি কারো এমন কোন সন্দেহ হয় যে, হয়তো যাদেরকে শরীক করা হচ্ছে তারা কোন রকম অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে, তবে একথা শুনে রাখ) যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অপরাপর শরীকদের উপাসনা ইবাদত করছে—(আল্লাহ্ জানেন,) এরা কিসের অনুসরণ করছে? (অর্থাৎ তাদের এ বিশ্বাসের যুক্তি কি? প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়—) শুধুমাত্র যুক্তিহীনভাবে (নিজেদের অলীক) কল্পনার আনুগত্য করছে এবং কল্পনাপ্রসূত

কথাবার্তা বলছে। (বস্তুতপক্ষে এদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির মত খোদায়ী কোন গুণই নেই। কাজেই এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করারও কোন সম্ভাবনা নেই।)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۶۷﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا

سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ

اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ

لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۶۹﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ

الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۰﴾

---

(৬৭) তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রবণ করে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন—তিনি পবিত্র। তিনি অমুখাপেক্ষী। যাকিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই তাঁর। তোমাদের কাছে তার কোন সনদ নেই। কেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ কর—যার কোন সনদই তোমাদের কাছে নেই? (৬৯) বলে দাও, যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না। (৭০) পার্থিবজীবনে সামান্যই লাভ, অতপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করার কঠিন আযাব—তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের জন্য তৈরি করেছেন রাত, যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পার। আর দিনকেও তেমনি বানিয়েছেন (তার আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কারণে) দেখাশোনার উপায় হিসাবে। এই নির্মাণের পেছনে (তওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে, সেসমস্ত লোকের জন্য যারা (মনোনিবেশ সহকারে এ বিষয়গুলো) শুনে থাকে। (মুশরিকরা এসব দলীল-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং শিরকী কথাবার্তাই বলতে থাকে। সুতরাং) তারা বলে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান-সন্ততি রয়েছে

(সুবহানাল্লাহ্ কি কঠিন কথা)! তিনি যে কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন (বরং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী)। যাকিছু আসমানসমূহ ও যমীনে বিদ্যমান সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। (সুতরাং যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তিনিই সব কিছুর মালিক; আর সব কিছুই তাঁর অধিকারভুক্ত, তখন একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠায় তাঁর কোন শরীক-অংশীদার কিংবা সমকক্ষ নেই। অতএব, সন্তানকে যদি আল্লাহ্র সমপর্যায়ভুক্ত বলা হয়, তবে তা পূর্বেই বাতিল হয়ে গেছে। আর যদি অসমপর্যায়ভুক্ত বলা হয়, তবে অসমপর্যায়ভুক্ত সন্তান হওয়া দূষণীয় বা ত্রুটি। অথচ আল্লাহ্ সমস্ত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত, পবিত্র। যেমন, سبحانه তে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই আল্লাহ্র সন্তান হওয়া সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে গেল। আমরা যে সন্তান না হওয়ার দাবি করেছিলাম, তার উপর আমরা দলীলও উপস্থাপন করে দিয়েছি। এখন রইল তোমাদের দাবি— বস্তুত) তোমাদের কাছে (ইহুদী দাবি ছাড়া) এ (দাবির) উপর কোন দলীলই নেই। (অতএব) তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ করছ যার (প্রমাণস্বরূপ কোন) জ্ঞানই তোমাদের নেই? (এতে তাদের অপবাদ আরোপকারী হওয়া প্রমাণ করে ঐ অপবাদের কারণে ভীতিপ্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে) বলে দিন যে, যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা-রোপ করে (যেমন, মুশরিকরা) তারা (কখনো) কৃতকার্য হবে না। (আর যদি এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ হয় যে, এ ধরনের লোকদেরকে পৃথিবীতে যথেষ্ট কৃতকার্যতা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করতে দেখা যায়, তবে তার উত্তর এই য,) সেটি (ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে) যৎসামান্য আরাম-আয়েশ (যা অতিশীঘ্র নিঃশেষ হয়ে যায়)। অতপর (মৃত্যুর পর) আমারই নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন (আখিরাতে) আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বদলা হিসাবে কঠিন শাস্তি (-এর স্বাদ) আস্বাদন করাব।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ
عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا
اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا
اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ
اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوْهُ
فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰۗىِٕفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٣﴾

(৭১) আর তাদেরকে শুনিয়ে দাও নূহের অবস্থা—যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহ্‌র আয়াত-সমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের শরীকদেরকেও সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতপর আমার সম্পর্কে যাকিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি দিও না। (৭২) তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় হল আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আনুগত্য অবলম্বন করি। (৭৩) তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে আবাদ করেছি। আর তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি; যারা আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লক্ষ্য কর, কেমন পরিণতি ঘটেছে তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি তাদেরকে নূহ (আ)-এর কাহিনী পড়ে শোনান (যা তখন সংঘটিত হয়েছিল---) যখন তিনি নিজের সম্প্রদায়কে বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের কাছে আমার (ওয়ায করতে) থাকা এবং আল্লাহ্‌র হুকুম-আহ্‌কামের নসীহত করা ভারী (ও অসহনীয়) মনে হয়, তবে (তাই হতে থাক,) আমি সেজন্য পরোয়া করি না। কারণ, আমার তো আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা রয়েছে। অতএব, তোমরা (আমার ক্ষতি-সাধনের ব্যাপারে) নিজেদের চেষ্টা-তদবীর (যাই কিছু করতে পার) নিজেদের (শরীক-দের সমন্বয়ে) পাকা করে নাও। (অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের শরীক উপাস্যরা সবাই মিলে আমার ক্ষতিসাধনে নিজেদের বাসনা পূর্ণ করে নাও—) তারপর যেন আর তোমাদের সে চেষ্টা-তদবীর তোমাদের অপমানের (ও মনোবেদনার) কারণ না হয়। (অর্থাৎ অধিকাংশ সময় গোপন অভিসন্ধিতে মন ছোট হয়ে যায়। কাজেই গোপন চেষ্টা-তদবীরের প্রয়োজন নেই। যে চেষ্টাই কর, মন খুলে প্রকাশ্যই কর, আমার দিকটি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমার চলে যাবার কিংবা বেরিয়ে যাবার আশংকা করো না। আর এত লোকের পাহারার ভেতর থেকে একটা লোকের বেরিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তাছাড়া গোপনীয়তার প্রয়োজনই বা কি?) তারপর আমার সাথে (যাকিছু করতে হয়) করে ফেল এবং আমাকে (একটুও) অবকাশ দিও না। (সারমর্ম হল এই যে, আমি তোমাদের কথায় না ভয় করি, আর না তবলীগ থেকে বিরত হতে পারি। এ পর্যন্ত তো ভয় না করার কথা বললেন। অতপর লোভহীনতা প্রসংগে বলেছেন—অর্থাৎ) এরপরেও যদি তোমরা পরাঙমুখতাই প্রদর্শন করতে থাক, তাহলে (একথা জেনে রাখ,) আমি তোমাদের কাছে (এ তবলীগের জন্য) কোন পারিশ্রমিক তো চাইছি না। (তাছাড়া চাইবই বা কেন? কারণ,) আমার পারিশ্রমিক তো শুধুমাত্র (প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে)

আল্লাহ্‌রই দায়িত্বে রয়েছে। (সারকথা, আমি না তোমাদেরকে ভয় করি, না তোমাদের কাছে কোন প্রত্যাশ্যা রাখি।) আর (যেহেতু) আমার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যাতে আমি আনুগত্যকারীদের সঙ্গে থাকি (সে কারণেই তবলীগের ব্যাপারে হুকুম পালন করছি। যদি তোমরা না মান, তাতে আমার কি ক্ষতি।) বস্তুত (এহেন মনোমুগ্ধকর উপদেশাবলীর পরেও) তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করতে থেকেছে (ফলে তাদের তুফানজনিত আযাব পতিত হয়েছে এবং) আমি (এ আযাব থেকে) তাঁকে এবং তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দান করি এবং তাদেরকে (যমীনের বুকে) আবাদ করি। আর (বাকি অন্য যারা ছিল,) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে (এ তুফানে) জলমগ্ন করে দিয়েছি। কাজেই লক্ষ্য করা উচিত, কি (মন্দ) পরিণতি হয়েছে তাদের, যাদেরকে (আল্লাহ্‌র আযাবের ব্যাপারে) ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (অর্থাৎ তাদেরকে অজান্তে ধ্বংস করা হয় না—প্রথমে বলে দেওয়া হয়, বুঝিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তারপরেও যখন অমান্য করে তখনই শাস্তি নেমে আসে।)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝٧٤

(৭৪) অনন্তর আমি নূহের পরে বহু নবী-রসূল পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, ঈমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এঁটে দেই সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনন্তর নূহ (আ)-র পর আমি অন্যান্য আরো রসূল পাঠিয়েছি তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের প্রতি। তাঁরা তাঁদের কাছে মু'জিযাসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন (কিন্তু) তাতেও (তাদের জেদ ও হঠকারিতার অবস্থা ছিল এই যে,) যে বিষয়টি তারা প্রথম (ধাপে) মিথ্যা বলে দিয়েছে, এমনটি আর হল না যে, পরে আর তা মেনে নেবে। (তাছাড়া যেমনি এরা ছিল অন্তরের দিক দিয়ে কঠোর) তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সে কাফিরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে (বন্ধ করে) দেন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝٧٥ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ

عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧٦ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ
لَمَّا جَآءَكُمْ ۭ اَسِحْرٌ هٰذَا ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝٧٧ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا
لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ
فِي الْاَرْضِ ۭ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٧٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ
بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۝٧٩ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى
اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۝٨٠ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ
السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٨١
وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨٢

(৭৫) অতপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মূসা ও হারূনকে ফিরাউন ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। (৭৬) বস্তুত তারা ছিল গোনাহগার। তারপর আমার পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য বিষয় উপস্থিত হল, তখন বলতে লাগলো, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌঁছার পর? এ কি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না। (৭৯) আর ফিরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদেরকে। (৮০) তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর, তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। (৮১) অতপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুষ্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। (৮২) আল্লাহ্ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপূত নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর (উল্লিখিত) সে পয়গম্বরগণের পরে আমি মূসা ও হারূনকে পাঠিয়েছি ফিরাউন এবং তার সর্দারদের প্রতি স্বীয় মু'জিযা (আ'ছা ও ইয়াদে বায়দা তথা লাঠি

ও দীপ্তিময় হাতের মু'জিযা) দিয়ে। তারা (এ দাবির সাথে সাথেই তাদের সত্যতা স্বীকার করার ব্যাপারে) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল (এবং সত্য গ্রহণের বিষয়ে চিন্তাটি পর্যন্ত করলো না।) বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত। (কাজেই আনুগত্য করল না।) তারপর যখন (দাবির পর) তাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে [মূসা (আ)-র নবুয়তের উপর] সঠিক দলীল-প্রমাণ (অর্থাৎ মু'জিযা) এসে পৌঁছাল, তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, নিঃসন্দেহে এটি প্রকাশ্য যাদু। মূসা (আ) বললেন, তোমরা এই প্রকৃষ্ট দলীল সম্পর্কে তোমাদের কাছে এসে পৌঁছার পরও কি এমন মন্তব্য করবে (যে, এটি যাদু)? এটি কি যাদু? অথচ যাদুকর (যখন নবুয়ত দাবি করে, তখন মু'জিযা প্রকাশে) কৃতকার্য হয় না। (পক্ষান্তরে আমি কৃতকার্য হয়েছি যে, প্রথমে দাবি করেছি এবং তারপর মু'জিযাও প্রকাশ করে দিয়েছি।) ওরা (এ বক্তব্যের কোন উত্তর দিতে পারল না বরং মূর্খজনোচিতভাবে) বলতে লাগল, তোমরা কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সে মত ও পথ থেকে সরিয়ে দেবে, যাতে আমরা আমাদের বড়দেরকে দেখছি? আর (তোমরা কি এ কারণে এসেছ যে,) তোমরা দু'জনে রাজ্য ও সর্দারী পেয়ে যাবে? (তারা আরও বলল) কিন্তু (তোমরা ভাল করে জেনে রাখ,) আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনো স্বীকার করব না। আর ফিরাউন (তার সর্দারদের উদ্দেশ করে) বলল, আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদেরকে (যারা আমার সাম্রাজ্যে রয়েছে) এনে উপস্থিত কর। (অতএব, সমবেতই করা হল।) যখন তারা এল [এবং মূসা (আ)-র সাথে মুকাবিলা হল, তখন] মূসা (আ) তাদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, যা কিছু তোমরা নিয়ে এসেছ সব (মাঠে) নিক্ষেপ কর। যখন তারা (নিজেদের যাদুর উপকরণাদি) নিক্ষেপ করল, তখন মূসা (আ) বললেন, যাকিছু তোমরা (বানিয়ে) এনেছ যাদু হল এগুলো (ফিরাউনের লোকেরা যাকে যাদু বলে সেগুলো নয়)! একথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই (যাদু) এখনই তছনছ করে দেবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এমন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না (যা মু'জিযার মুকাবিলায় উপস্থিত হয়)। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা (যেমন মিথ্যাপন্থীদের মিথ্যাকে সত্য মু'জিযার মুকাবিলায় বাতিল করে দেন, তেমনিভাবে) সত্য-সঠিক প্রমাণ (অর্থাৎ মু'জিযা)-কে স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী (নবী-রসূলগণের নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ) প্রতিষ্ঠিত করে দেন, অপরাধী (কাফির) লোকদের কাছে তা যতই খারাপ লাগুক না কেন।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ
مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ
تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(৮৩) আর কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি, তাঁর কওমের কতিপয় বালক ছাড়া ---ফিরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফিরাউন দেশময় কর্তৃত্বের শিখরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখে-ছিল। (৮৪) আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাঁবরদারও হয়ে থাক। (৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমা-দের উপর এ জালিম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। (৮৬) আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই কাফিরদের কবল থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর (যখন 'আছা'-এর মু'জিযা প্রকাশ পেল, তখন) মূসা (আ)-র উপর (প্রথম প্রথম) তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মাত্র গুটিকতক লোক ঈমান আনল। তাও ফিরাউন এবং তার শাসকবর্গের ভয়ে যে, না জানি (একথা প্রকাশ হয়ে গেলে) তাদেরকে এরা কোন কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয়। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে (তাদের এ ভয় অমূলকও ছিল না। কারণ,) ফিরাউন ছিল সে দেশে (রাজ) ক্ষমতার অধিকারী। তদুপরি সে ন্যায় ও ইনসাফের (গণ্ডি ছাড়িয়ে) বাইরে চলে যেত---(অত্যাচার উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে দিত। কাজেই যে লোক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসহ অত্যাচার করে তার প্রতি ভয় লাগাই স্বাভাবিক।) আর মূসা (আ) (যখন তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখলেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি (তোমরা সত্য মনে) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ তবে (চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে বরং) তাঁর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা (তাঁর) অনুগত হয়ে থাক। (তারা উত্তরে) নিবেদন করল, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি---(এ প্রার্থনা করার পর যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না এবং স্বীয় রহমতে আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নাজাত দান কর।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا
وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ

أَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا
اطْمِسْ عَلٰٓى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتّٰى
يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا
وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَجٰوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ
الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۭ حَتّٰٓى إِذَآ
أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ اٰمَنَتْ
بِهٖ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ
عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

(৮৭) আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘর-গুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর। (৮৮) মূসা বলল, হে আমার পরওয়ারদিগার, তুমি ফিরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ— হে আমার পরওয়ারদিগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার পরওয়ারদিগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়। (৮৯) বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু'জন অটল থাক এবং তাদের পথে চলো না যারা অজ্ঞ। (৯০) আর বনী ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফিরাউন ও তার সেনা-বাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাইলরা। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (৯১) এখন এ কথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি (সে দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলাম।) মূসা (আ) ও তাঁর ভাই [হারূন (আ)]-এর নিকট ওহী পাঠালাম যে, তোমরা উভয়ে নিজেদের লোকদের জন্য

(যথাবিহিত) মিসরেই বাসস্থান স্থায়ী রাখ। (অর্থাৎ তারা যেন ভীত হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে না যায়। আমি তাদের রক্ষাকারী।) আর (নামাযের সময় হলে) তোমরা সবাই নিজেদের সে বাসস্থানকেই নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করে নাও---ভয়ভীতির দরুন মসজিদে উপস্থিতি ক্ষমা করা গেল। তবে নামাযের অনুবর্তিতা (অপরিহার্যভাবে) করবে। (যাতে নামাযের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'আলা যথাশীঘ্র এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেন।) আর (হে মূসা,) আপনি মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন (যে, শীঘ্রই এ বিপদ দূর হয়ে যাবে)। বস্তুত মূসা (আ) (স্বীয় প্রার্থনায় নিবেদন করলেন,) হে আমাদের পরওয়ারদিগার, (আমরা একথা জানতে পেরেছি যে,) আপনি ফিরাউন এবং তার সর্দারদেরকে আড়ম্বরের উপকরণ এবং পার্থিব জীবনের বিভিন্ন রকমের মালামাল দিয়েছেন; হে আমাদের পালনকর্তা, একারণেই দিয়েছেন যে, তারা আপনার পথ থেকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। (সুতরাং তাদের ভাগ্যে যখন হিদায়ত প্রাপ্তি নেই এবং এর পেছনে যে হিকমত ছিল তাও যখন বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, তখন তাদের মালামাল এবং অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাই হবে কেন। সুতরাং) হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তাদের সমস্ত মালামাল ও ধনসম্পদ নাস্তানাবুদ করে দিন, আর (স্বয়ং তাদের ধ্বংসের এমন ব্যবস্থা করে দিন যে,) তাদের অন্তরসমূহে (অধিক) কঠোর করে দিন যাতে তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়ে পড়ে এবং যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে; (বরং ক্রমাগত তাদের কুফরীই যেন বেড়ে যায়) এমনকি এরা যেন মহা আযাব (এর যোগ্য) হয়ে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে নেয় [বস্তুত এমন পর্যায়ে ঈমান আনা হলে তাতে কোনই লাভ হয় না। যাহোক, হযরত মূসা (আ) যখন এই দোয়া করেন, তখন হযরত হারূন (আ) তাঁর সাথে সাথে 'আমীন বলে যাচ্ছিলেন।---(দুররে-মনসূর) আল্লাহ্ বললেন,] তোমাদের উভয়ের দোয়া কবূল করা হয়েছে। (কারণ, আমীন বললেই দোয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়ে যায়। উভয়ের দোয়া কবূল হওয়া অর্থ এই যে, আমি তাদের ধনসম্পদ ও অস্তিত্বকে শীঘ্রই ধ্বংস করতে যাচ্ছি।) যাহোক, তোমরা (তোমাদের দায়িত্বে অর্থাৎ প্রচারকার্যে) অটল থাক। (অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে হিদায়ত না থাকলেও প্রচারে তোমাদের লাভ রয়েছে।) আর তোমরা সেসব লোকের পথে চলো না, (আমার ওয়াদার সত্যতা কিংবা কোন বিষয়কে বিলম্বিত করার মাঝে বিশেষ হিকমত থাকা অথবা তবলীগ তথা ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে) যাদের জ্ঞান নেই। (অর্থাৎ আমার ওয়াদাকে সত্য জানবে এবং তাদের ধ্বংসে যদি বিলম্বও ঘটে, তবে তাতে কোন হিকমত রয়েছে বলে মনে করবে এবং দায়িত্ব হিসাবে তোমাদের যে কাজ তাতে লেগে থাকবে।) বস্তুত [আমি যখন ফিরাউনকে ধ্বংস করতে চাইলাম, তখন মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, বনি ইসরাইলকে মিসর থেকে যেন বের করে নিয়ে যায়। সুতরাং তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলেন। পথে লোহিত সাগর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-র দোয়ায় তাতে পথ হয়ে গেল। তারপর] আমি বনি ইসরাঈলকে (সেই) নদী পার করে দিলাম। অতপর তাদের পেছনে পেছনে ফিরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে (নদীর মধ্য দিয়ে) এগিয়ে চলল (যে, নদীর ভেতর

থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। কিন্তু তারা নদী পার হতে পারল না)। শেষ পর্যন্ত যখন ডুবতে আরম্ভ করল (এবং আযাবের ফেরেশতাদের দেখতে পেল), তখন (ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে) বলতে লাগল, আমি ঈমান আনছি যে, একমাত্র তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইলরা এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (অতএব, আমাকে এই ডোবা এবং আখিরাতের আযাব থেকে নাজাত দান করা হোক) অথচ (আখিরাতের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করার) পূর্ব পর্যন্ত অবাধ্যতা প্রদর্শন করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। পক্ষান্তরে এমন মুক্তি চাইছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আ) এবং বনি ইসরাইল ও ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তাহল এই যে, বনি ইসরাইল যারা মূসা (আ)-র দীনের উপর আমল করত তাদের সবাই অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের 'সওমাআহ্' তথা উপাসনালয়েই নামায আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের নামায ঘরে পড়লে আদায় হত না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী (সা)-র উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনখানে ইচ্ছা নামায আদায় করে নিতে পারে। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে; সব জায়গাতেই নামায আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরয নামাযসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রসূলে করীম (সা) এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরয নামাযই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যাহোক, বনি ইসরাইলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামায আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফিরাউন যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপাসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল যাতে এরা নিজেদের ধর্মানুযায়ী নামায পড়তে না পারে। এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বনি ইসরাইলের উভয় পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে এ নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনি ইসরাইলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামায আদায় করতে পারে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপাসনালয়েই নামায পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বনি ইসরাইলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামায আদায় করে নেওয়ার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে যে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে

নির্ধারিত সে ঘরেই নামায পড়ার কথা বলা হয়েছিল যা কিবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার অনুমতি তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী (সা)-র উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোন নগরে কিংবা মাঠে যে কোন স্থানে নামায আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মত যে, এ আয়াতে বনি ইসরাইলদেরকে যে কিবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তা কোন্ কিবলা ছিল---কা'বা ছিল, না বায়তুল মুকাদ্দাস? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আ) ও তাঁর আসহাবের কেবলা।---(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী) বরং কোন কোন ওলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসূলের কিবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদের নামাযে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে'র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

এ আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামায পড়ার জন্য কিবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসূলের শরীয়তেই নামাযের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আবাসগৃহসমূহকে কিবলামুখী করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাতেই যেন নামায আদায় করা হয়। সেজন্য তার পরে পরেই وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ-এর নির্দেশ দানের মাধ্যমে হিদায়ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফিরাউন যদি নির্ধারিত উপাসনালয়ে নামায আদায় করতে বাধা দান করে, তবে তাতে নামায রহিত হয়ে যাবে না, বরং নিজ নিজ ঘরে তা আদায় করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মু'মিনগণকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; শত্রুর উপর তাদের জয় হবে এবং আখিরাতে তারা জান্নাতপ্রাপ্ত হবে।---(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের শুরুতে হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে দ্বিবচন পদের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে। তার কারণ, আবাসগৃহগুলোকে কিবলামুখী করে তাতে নামায পড়ার অনুমতিদান ছিল তাঁদেরই কাজ। অতপর বহুবচন পদের মাধ্যমে সমস্ত বনি ইসরাইলকে অন্তর্ভুক্ত করে নামায প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ, এ নির্দেশে পয়গম্বর ও উম্মত সবাই শামিল। সবশেষে সুসংবাদ দানের নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে

বিশেষ করে হযরত মূসা (আ)-কে। তার কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন শরীয়তের অধিকারী নবী; জান্নাতের সুসংবাদ দান তাঁরই হক বা অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হযরত মূসা (আ) যে বদদোয়া করেছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে। এর প্রারম্ভে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন করেন যে, আপনি ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের পার্থিব আড়ম্বরের সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-দৌলত যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়েছেন। মিসর থেকে শুরু করে আবিসিনিয়া পর্যন্ত সোনা-চাঁদী, হীরা-জহরতের খনিসমূহ দিয়ে রেখেছেন—(কুরতুবী), যার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে গোমরাহ করে দিচ্ছে। কারণ, সাধারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ-বিলাস দেখে এমন সংশয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে যে, সত্যি যদি এরা গোমরাহীর মধ্যেই থাকবে, তবে এরা আল্লাহ্ তা'আলার এসব নিয়ামত কেমন করে পেতে পারে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এই তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছাতে পারে না যে, নেক আমল ব্যতীত যদি কারো পার্থিব উন্নতি হয়, তবে তা তার ন্যায়-নিষ্ঠার লক্ষণ হতে পারে না। হযরত মূসা (আ) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ার পর, তার ধনৈশ্বর্যে অন্য লোকদের গোমরাহ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে বদদোয়া করেন—رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তার ধনৈশ্বর্যের রূপকে পরিবর্তিত করে বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

হযরত কাতাদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, এই দোয়ার প্রতিক্রিয়ায় ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত হীরা-জহরত, নগদ মুদ্রা এবং বাগ-বাগিচা, শস্য-ক্ষেত্রের সমস্ত ফল-ফসল পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে ফিরাউনের আমলের কিছু জিনিসপত্র রক্ষিত ছিল। তাতে ডিম এবং বাদামও দেখা যায় যা সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গিয়েছিল।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমস্ত ফল-মূল, তরিতরকারি ও খাদ্যশস্যকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সেই নয়টি (মু'জিযাসুলভ) নিদর্শনের একটি যার আলোচনা কোরআন করীমের وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ আয়াতে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বদদোয়া হযরত মূসা (আ) তাদের জন্য করছিলেন এই وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ অর্থাৎ ইয়া পরওয়ারদিগার, তাদের অন্তরগুলোকে এমন কঠিন করে দাও, যেন তাতে ঈমান এবং অন্য কোন সৎ-

কর্মের যোগ্যতা না থাকে; যাতে তারা বেদনাদায়ক আযাব আসার পূর্বে ঈমান আনতে না পারে।

কোন নবী-রসূলের মুখে এমন বদদোয়া বাহ্যত অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ, মানুষকে ঈমান ও সৎকর্মের আমন্ত্রণ জানানো এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনা করাই হয়ে থাকে নবী-রসূলগণের জীবনের ব্রত।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনা হল এই যে, হযরত মূসা (আ) যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের পরে তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কামনা করছিলেন যে, এরা যেন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। এতে এমন একটা সম্ভাবনাও বিদ্যমান ছিল যে, এরা না আবার আযাব আসতে দেখে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে দেয় এবং তাতে করে আযাব স্থগিত হয়ে যায়—তাই কুফরের প্রতি ঘৃণাবিদ্বেষই ছিল এই প্রার্থনার কারণ। যেমন, ফিরাউন ডুবে মরার সময় ঈমানের স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করলে জিবরাঈল আমীন তার মুখ বন্ধ করে দেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণায় সে আযাব থেকে বেঁচে যেতে না পারে।

তাছাড়া এমন হতে পারে যে, এই বদদোয়াটি প্রকৃতপক্ষে বদদোয়াই নয়, বরং শয়তানের উপর যেমন লা'নত করা হয় তেমনি বিষয়। সে যখন কোরআনের প্রকৃষ্ট বর্ণনা মতই লা'নতপ্রাপ্ত তখন তার উপর লা'নত করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার উপর লা'নত চাপিয়ে দিয়েছেন, আমরাও তার উপর লা'নত করি। এ ক্ষেত্রে মর্ম দাঁড়াবে এই যে, তাদের অন্তরসমূহের কঠোর হয়ে পড়া এবং ঈমান ও সংশোধনের যোগ্য না থাকা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ) বদদোয়ার আকারে সে বিষয়টিই প্রকাশ করেছেন মাত্র।

তৃতীয় আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র উক্ত দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত হারূন (আ)-কেও দোয়ার অংশীদার সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে ঃ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করে নেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কোন দোয়ায় 'আমীন' বলাও দোয়ারই অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু কোরআন করীমে নিঃশব্দে দোয়া করাকেই দোয়ার সুন্নত নিয়ম বলে অভিহিত করা হয়েছে, কাজেই এতে 'আমীন'ও নিঃশব্দে বলাই উত্তম বলে মনে হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গম্বরকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হিদায়তও দেওয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ নিজেদের উপর

অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরীতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহিলদের মত তাড়াহুড়া করবেন না।

চতুর্থ আয়াতে হযরত মূসা (আ)-র বিখ্যাত মু'জিযা সাগর পাড়ি দেওয়া এবং ফিরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে ঃ حَتّٰى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি যে, যে আল্লাহ্‌র উপর বনি ইসরাইলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে ঃ اٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ কি এখন মুসলমান হচ্ছ, অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে?

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন, যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়।---(তিরমিযী)

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখিরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মু'মিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফিরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফিরাউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কোরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফিরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোন ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।---(রূহুল মা'আনী)

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা যদি এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় কারো মুখ দিয়ে কুফরী বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফিরও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামায পড়ে তাকে মুসলমানদের মত দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরী বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোন কোন ওলীআল্লাহ্‌র অবস্থার দ্বারাও তার সমর্থন

পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরী বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে যখন তাঁর কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাতলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল বটে।

সারকথা এই যে, যখন রূহ্ বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোন আমল বা কার্যকলাপ শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ, এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ্ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কি তার পূর্ব মুহূর্ত।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَاِنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ
اِسْرَاۗءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا
حَتّٰى جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
فَسْـَٔـلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاۗءَكَ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ اِنَّ
الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَوْ جَاۗءَتْهُمْ
كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ
اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا
عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

(৯২) অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (৯৩) আর আমি বনী ইসরাইলদেরকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু-সামগ্রী। বস্তুত তাদের মধ্যে মত-বিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সংবাদ। নিঃসন্দেহে তোমার পরওয়ারদিগার তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন, যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল। (৯৪) সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পর-ওয়ারদিগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিন-কালেও সন্দেহকারী হয়ো না (৯৫) এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ্‌র বাণীকে। তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে (৯৬) যাদের ব্যাপারে তোমার পরওয়ারদিগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। যদি তাদের সামনে সমস্ত নিদর্শনাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আযাব! (৯৭) সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হল না যা ঈমান এনেছে অতপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতএব, (প্রার্থিত মুক্তির বদলে) আজ আমি তোমার মৃতদেহকে (পানিতে তলিয়ে যাওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দেব, যাতে তাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ হও, যারা তোমার পরে (বর্তমান) রয়েছে। (তারা যেন তোমার দুরবস্থা ও ধ্বংস দেখে আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে।) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (এসবের পরেও) বহু লোক আমার (এমন সব) শিক্ষণীয় বিষয়ে অমনোযোগী (এবং আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকামের বিরো-ধিতায় নির্ভীক)। আর আমি (ফিরাউনের জলমগ্নতার পর) বনী ইসরাইলদেরকে বসবাস করার জন্য অতি উত্তম ঠিকানা দান করেছি। (তাৎক্ষণিকভাবে তো তারা মিসরের আধিপত্য লাভ করেছেই, তদুপরি তাদের প্রথম বংশধরকেই আমালেকা সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দানের মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়ার আধিপত্য দান করেছি।) তাছাড়া আমি এখানে তাদেরকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন বস্তুসামগ্রী খাবার জন্য দিচ্ছি। (বস্তুত মিসরেও বাগ-বাগিচা, নহর-নালা ছিল এবং সিরিয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে بَارَكْنَا فِيهَا অর্থাৎ এতে আমি বরকত দিয়েছি। সুতরাং (এ সমুদয় কারণে আমার আনুগত্যে অধিকতর ব্যাপৃত থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু তার বিপরীতে তারা দীনের

ব্যাপারে বিরোধ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তদুপরি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে,) তারা (কোন অজ্ঞতার দরুন) এ মতবিরোধ করেনি; বরং তাদের কাছে (বিধি-বিধান সংক্রান্ত) জ্ঞান পৌঁছে যাবার পরই মতবিরোধ করেছে। অতপর এ মতবিরোধের উপর ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, আপনার পরওয়ারদিগার এসব (মতবিরোধকারী) লোকদের মাঝে কিয়ামতের দিন সে সমস্ত বিরোধীয় বিষয় (কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যাতে তারা বিরোধ করছিল। অতপর (দীনে-মুহাম্মদীর বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আমি এমন এক যথার্থ পন্থা বাতলে দিচ্ছি যে, যারা ওহীপ্রাপ্ত নয় তাদের জন্য তা কেন যথেষ্ট হবে না, আপনি যে ওহীপ্রাপ্ত, কিন্তু আপনাকেও যদি শর্তসাপেক্ষে এ সম্পর্কে সম্বোধন করা হয় তবে এভাবে করা যেতে পারে যে,) যদি (মেনে নেওয়া হয়,) আপনি এর (অর্থাৎ এ কিতাবের) ব্যাপারে সন্দেহ (সংশয়)-এ পতিত হয়ে থাকেন যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি, তবে (এ সন্দেহের অপনোদনের জন্য এও একটি সহজ পন্থা রয়েছে যে,) আপনি সেসব লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখুন যারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে থাকে। (উদ্দেশ্য তওরাত ও ইঞ্জীল। তারা পাঠক হিসাবে তার ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে এই কোরআনের সত্যতা বাতলে দেবে।) নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার নিকট সত্য কিতাব এসেছে। আপনি কস্মিনকালেও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না এবং সন্দেহকারীদের অতিক্রম করে সে সমস্ত লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অন্যথায় (নাউযু-বিল্লাহ,) আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, যাদের ব্যাপারে আপনার পরওয়ারদিগারের (এই চিরাচরিত) বাক্য (যে, এরা ঈমান আনবে না) নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা (কখনই) ঈমান আনবে না যদিও তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) যাবতীয় দলীল পৌঁছে যায়; যতক্ষণ না তারা বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেবে (কিন্তু তখনকার ঈমান আনায় কোনই লাভ হবে না)। সুতরাং (যেসব জনপদের উপর আযাব এসে গেছে, সেগুলোর মধ্য থেকে) কোন জনপদই ঈমান আনেনি যা তার জন্য উপকারী বা লাভজনক হতে পারত। কারণ, তাদের ঈমান আনার সাথে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সংযোগ ঘটেনি। অবশ্য ইউনুস (আ)-এর জাতি (যাদের ঈমানের সাথে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সংযোজিত হয়েছিল, সে কারণে তারা প্রতিশ্রুত আযাবের প্রাথমিক লক্ষণ দেখেই ঈমান নিয়ে আসে এবং) যখন তারা ঈমান নিয়ে আসে, তখন আমি অপমানজনক পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে আযাব রহিত করে দেই এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ মৃত্যুকাল) পর্যন্ত (কল্যাণজনক) স্বাচ্ছন্দ্য দান করি। বস্তুত অন্যান্য জনপদের ঈমান আনা এবং ইউনুস (আ)-এর জাতির ঈমান আনা উভয়টিই হয়েছিল ইচ্ছাভিত্তিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে ফিরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলদেরকে ফিরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফিরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফিরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফিরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপরে এই লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফিরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজো সে স্থানটি 'জাবালে ফিরাউন' নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফিরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফিরাউনই সে ফিরাউন যার সাথে হযরত মূসা (আ)-র মুকাবিলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনও ফিরাউন। কারণ, ফিরাউন শব্দটি কোন একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহ্কেই ফিরাউন পদবী দেওয়া হত।

কিন্তু এটাও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, বহু লোক আমার আয়াতসমূহ এবং নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে অমনোযোগী, সেগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করে না এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অন্যথায় পৃথিবীর প্রতিটি অণুকণায় এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, যা লক্ষ্য করলে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে ফিরাউনের করুণ পরিণতির মুকাবিলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে যাদেরকে ফিরাউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনি ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য

মীরাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কোরআন করীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতপর বলা হয়েছে ঃ আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তুসামগ্রী ও আরাম-আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রসূলে করীম (সা) সম্পর্কে তওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করত তাতে তাঁর আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহ ও তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ যমানার নবীর ওসীলা দিয়ে দোয়া করত, কিন্তু যখন শেষ যমানার নবী (সা) তাঁর যাবতীয় প্রমাণ এবং তাওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর আগমনকে جَاءَهُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে علم বলতে 'নিশ্চিত বিশ্বাস' ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ কথাও বলেছেন যে, এখানে علم অর্থ معلوم অর্থাৎ যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হল যা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

আয়াতের শেষ ভাগে বাহ্যত মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও একথা অতি স্পষ্ট যে, ওহী সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজেই এই সম্বোধনের মাধ্যমে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; স্বয়ং তিনি উদ্দেশ্য নন। আবার এমনও হতে পারে যে, এতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, হে মানবকুল এই ওহীর ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থেকে থাকে, যা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র মাধ্যমে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, তাহলে তোমরা সেসব লোকের কাছে জিজ্ঞেস কর,

যারা তোমাদের পূর্বে আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করত। তাহলে তারা তোমাদেরকে বলে দেবে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী (আ) ও তাঁদের কিতাবসমূহ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র সুসংবাদ দিয়ে এসেছে। তাতে তোমাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে লোকের মনে দীনী ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ উদয় হয়, তার কর্তব্য হল এই যে, সত্যপন্থী আলিমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে সন্দেহ-সংশয় দূর করে নেবে, সেগুলো মনের মাঝে লালন করবে না।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একই বিষয়বস্তুর সমর্থন ও তাকীদ এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের প্রতি সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে।

সপ্তম আয়াতে শৈথিল্যপরায়ণ মুনকেরদিগকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, জীবনের অবকাশকে গনীমত মনে কর, অস্বীকার এবং অবাধ্যতা থেকে এখনও বিরত হও। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে, যখন তওবা করলেও তা কবুল হবে না কিংবা ঈমান আনলেও তা কবুল হবে না। আর সে সময়টি হলো যখন মৃত্যুকালে আখিরাতের আযাব সামনে এসে উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গেই হযরত ইউনুস (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমনটি কেন হল না যে, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী জাতিসমূহ এমন এক সময়ে ঈমান নিয়ে আসত, যখন তাদের ঈমান তাদের জন্য লাভজনক হত! অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কিংবা আযাব অনুষ্ঠান ও আযাবে পতিত হয়ে যাবার পর অথবা কিয়ামত সংঘটনের সময় যখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কারও ঈমান কবুল হবে না। কাজেই তার পূর্বাহ্নেই নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে যেন বিরত হয়ে যায় এবং ঈমান নিয়ে আসে। অবশ্য ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যখন এমন সময় আসার পূর্বাহ্নে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব আসতে দেখল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিল এবং ঈমান গ্রহণ করে ফেলল যার ফলে আমি তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব সরিয়ে নিলাম।

তফসীরের সারমর্ম এই যে, দুনিয়ার আযাব সামনে এসে উপস্থিত হলেও তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় না; বরং তখনও তওবা কবুল হতে পারে। অবশ্য আখিরাতের আযাবের উপস্থিতি হয় কিয়ামতের দিন হবে কিংবা মৃত্যুকালে। তা সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু হোক অথবা কোন পার্থিব আযাবে পতিত হওয়ার মাধ্যমেই হোক, যেমনটি হয়েছিল ফিরাউনের ক্ষেত্রে।

সে কারণেই হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়া সাধারণ আল্লাহ্‌র রীতি বিরোধী হয়নি, বরং তারই আওতায় হয়েছে। কারণ, তারা যদিও আযাবের আগমন প্রত্যক্ষ করেই তওবা করেছিল, কিন্তু তারা সে আযাবে পতিত হওয়ার কিংবা মৃত্যুর পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে যেহেতু ফিরাউন ও অন্য

লোকদের যারা আযাবে পতিত হওয়ার পর মৃত্যুর ঊর্ধ্বশ্বাস শুরু হওয়ার সময় তওবা করেছে এবং ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেহেতু তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং সে তওবাও কবুল হয়নি।

ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনার একটি উদাহরণ স্বয়ং কোরআন করীমে বর্ণিত বনি ইসরাঈলদের সে ঘটনা যাতে তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর টাঙ্গিয়ে দিয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তাতে তারাও তওবা করে নেয় এবং সে তওবা কবুল হয়ে যায়। সূরা বাকারায় এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ -

অর্থাৎ আমি তাদের মাথার উপর তূর পর্বতকে টাঙ্গিয়ে দিয়ে নির্দেশ দান করলাম যে, যেসব হুকুম-আহকাম তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর।

এর কারণ ছিল এই যে, তারা আযাব সংঘটিত হওয়ার এবং মৃত্যুতে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নে শুধু আযাবের আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করে তওবা করে নিয়েছিল। তেমনি-ভাবে ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় আযাবের আগমন লক্ষ্য করেই নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তওবা করে নেয় (এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে)। কাজেই ঐ তওবা কবুল হয়ে যাওয়াটা উল্লিখিত রীতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় নয়। —(কুরতুবী)

এ ক্ষেত্রে সমকালীন কোন কোন লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আ)-এর প্রতি রিসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গম্বরের শৈথিল্যকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই শৈথিল্যকেই আল্লাহ্‌র রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ ঃ "কোরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আ)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, ইউনুস (আ)-এর দ্বারা রিসালতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আযাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তাঁর সঙ্গীসাথীগণ তওবা-ইস্তেগফার করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব রীতি-মূলনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন জাতি-সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রিসালতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ্‌র ন্যায়নীতি

তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আযাব দান করতে সম্মত হয়নি। ---(তাফ্হীমুল কোরআন ঃ মাওলানা মওদুদী, পৃষ্ঠা ৩১২, জিলদ---২)

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা-কবীরা সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকেই, না শুধু কবীরা গোনাহ্ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোই কোন মতবিরোধ নেই যে, নবী-রসূলগণের কেউই রিসালতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ, নবী-রসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে নির্বাচন করেছেন, তাঁরা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খিয়ানত, যা সাধারণ শালীনতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ।

কোরআন ও সন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থী বাহ্যিক কোন কথা যদি কোরআন-হাদীসের মাঝেও কোনখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কোরআন-হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লিখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কোরআন করীম ও হযরত ইউনুস (আ)-এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে-ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোন গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কোরআনী ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরে নেয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ)-এর কওমের উপর থেকে আযাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও পরিপন্থী। তারপর এর সাথে এ কথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, ঐশী রীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লংঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রিসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে এ কথাও ধরে নেয়া হয়েছে যে, পয়গম্বরের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দীনের প্রতি আহবান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সামান্যতম বিচার-বিবেচনাও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কোরআনের আয়াতের বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনইবা এমন হল না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো! অর্থাৎ আযাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসত, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, তারা আযাবের লক্ষণাদি দেখে আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোন ঐশীরীতি লংঘন করা হয়নি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমান ও তওবা কবুল করে নেয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তফসীরকার বাহরে-মুহীত, কুরতুবী, যখমশরী, মাযহারী, রূহল-মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ আল্লাহ্‌র রীতির আওতায়ই হয়েছে। কুরতুবীর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

وقال ابن جبير غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر فلما صدقت توبتهم رفع الله عنهم العذاب - وقال الطبرى خص قوم يونس من بين سائر الامم بان تيب عليهم بعد معاينة العذاب وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين - وقال الزجاج انهم لم يقع بهم العذاب وانما رأوا العلامة التى تدل على العذاب ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم ايمانهم - قلت قول الزجاج حسن فان المعاينة التى لاتنفع التوبة معها هى التلبس بالعذاب كقصة فرعون ولهذا جاء بقصة قوم يونس على اثر قصة فرعون، ويعضد هذا قوله عليه السلام ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر والغرغرة الحشرجة وذلك هو حال التلبس بالموت وقد روى معنى ماقلناه عن ابن مسعود رض (الى)

وهذا يدل على ان توبتهم قبل رؤية العذاب (الى) وعلى هذا فلا اشكال ولا تعارض ولا خصوص -

অর্থাৎ ইবনে জুবাইর (র) বলেন যে, আযাব তাদেরকে এমনভাবে আবৃত করে নেয়, যেমন কবরের উপর চাদর। তারপর যেহেতু তাদের তওবা (আযাব আসার পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন) যথার্থ হয়ে যায়, তাই তাদের আযাব তুলে নেয়া হয়। তাবারী বলেন যে, সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের উপর ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়কে এই বৈশিষ্ট্য দান করা হয় যে, আযাব প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের তওবা কবুল করে নেয়া হয়। যুজাজ বলেন যে, তাদের উপর তখনও আযাব পতিত হয়নি; বরং আযাবের লক্ষণই শুধু দেখতে পেয়েছিল। যদি আযাব পতিত হয়ে যেত, তবে তাদের তওবাও কবুল হত না। কুরতুবী বলেন যে, যুজাজের মতটি উত্তম ও ভাল। কারণ, যে আযাব দর্শনের পর তওবা কবুল হয় না তা হল সে আযাব যাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছে ফিরাউনের ঘটনায়। আর সে কারণেই এ সূরায় ইউনুসের সম্প্রদায়ের ঘটনাটি ফিরাউনের ঘটনার লাগালাগি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ পার্থক্য নিরূপিত হয়ে যায় যে, ফিরাউনের ঈমান ছিল আযাবে পতিত হবার পর; আর তার বিপরীতে ইউনুস সম্প্রদায়ের ঈমান ছিল আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বে। এই দাবির সমর্থন মহানবী (সা)-র বাণীতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, বান্দার তওবা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না সে মৃত্যুর গরগরা বা মুমূর্ষু অবস্থার সম্মুখীন হয়। আর গরগরা বলা হয় মৃত্যুকালীন অচেতন অবস্থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতেও এ কথাই বোঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় আযাবে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। কুরতুবী বলেন যে, এই বক্তব্য ও বিশ্লেষণে না কোন আপত্তি আছে, না আছে স্ববিরোধিতা, আর নাই বা আছে ইউনুস সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্টতা।

আর তাবারী প্রমুখ তফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউই একথা বলেন নি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল ইউনুস (আ)-এর ত্রুটিসমূহ। বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহ্র জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায়ের আযাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ আল্লাহ্র রীতির পরিপন্থী নয়, বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে কোরআনের কোন বক্তব্যে এ কথা প্রমাণিত নেই যে, আযাবের দুঃসংবাদ শোনানোর পর ইউনুস (আ) আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান। বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, সমস্ত সাবেক উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ চলে

আসছিল অর্থাৎ তাদের উম্মতের উপর আযাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন---যেমন হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে কোরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে---তেমনিভাবে এখানেও আল্লাহ্ তা'আলার সে নির্দেশ যখন ইউনুস (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেয়া হয় যে, তিন দিন পর আযাব আসবে, ইউনুস (আ)-এর সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টত একথাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার দিক দিয়ে ইউনুস (আ)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফ্ফাতের আয়াতসমূহে যে ভর্ৎসনা-সূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে, তা এজন্য নয় যে, তিনি রিসালতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, বরং ঘটনাটি তা-ই, যা উপরে প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে লেখা হয়েছে। তা হল এই যে, হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক তিন দিন পর আযাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। পরে যখন আযাব আসেনি, তখন ইউনুস (আ)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণেরও আশংকা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথই ছিল না। কিন্তু নবী-রসূলগণের রীতি হল এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনদিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তাঁরা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনুস (আ)-এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ না হলেও নবী-রসূলগণের রীতির পরিপন্থী ছিল। কোরআনের আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, ইউনুস (আ)-এর পদস্খলন রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোন কিছুই প্রমাণিত হবে না। সূরা সাফ্ফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে اَبَقَ শব্দ ভর্ৎসনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হল স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা-আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে ঃ

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ -

এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রিসালতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশংকা দেখা দেয়। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اى غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادى امرارهم مع طول دعوته اياهم وكان ذهابه هذا سهم هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به

অর্থাৎ ইউনুস (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ-কাল পর্যন্ত রিসালতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেন নি।

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রিসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লিখিত সমকালীন তফসীরকারকে কোন কোন ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা সাফ্ফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দ্বারাই তাঁর এ মত-বাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আ)-এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ) রিসা-লতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমন সব ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাইলী রেওয়ায়েত মুসলিম তফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা ইউনুস (আ)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আ)-এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রিসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত গ্রহণও করেন নি।

والله سبحانه وتعالى اعلم وبه استغيث ان يعصمنا من

হযরত ইউনুস (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনা ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা যার কিছু কোরআনের এবং কিছু হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, তা এই যে, ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ইরাকের বিখ্যাত মুছিল এলাকার নেনওয়া নামক জনপদে বসবাস করত। কোরআনে তাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইউনুস (আ)-কে পাঠান। তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে। আল্লাহ্ তা'আলা ইউনুস (আ)-কে নির্দেশ দান করেন যেন এদের জানিয়ে দেন যে, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আযাব নাযিল হবে। হযরত ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের মাঝে এ ঘোষণা দিয়ে দেন। অতপর ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এ বিষয়ে একমত হয় যে, আমরা কখনও ইউনুস (আ)-কে মিথ্যা বলতে শুনিনি। কাজেই তাঁর কথা উপেক্ষা করার মত নয়। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল যে, দেখা যাক, ইউনুস (আ) রাতের বেলা আমাদের মাঝে নিজের জায়গায় অবস্থান করেন কি না। যদি তিনি তাই করেন তবে বুঝব, কিছুই হবে না। আর যদি তিনি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করব যে, ভোরে আমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব নেমে আসবে। হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কথামত রাতের বেলায় সেই বস্তি থেকে বেরিয়ে যান। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এক কালো ধোঁয়া ও মেঘের আকারে তাদের মাথার উপর চক্রাবর্তের মত ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আকাশ দিগন্তের নিচে তাদের নিকটবর্তী হয়ে আসতে থাকে। তখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এবার আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। এ অবস্থা দেখে তারা হযরত ইউনুস (আ)-এর সন্ধান করতে আরম্ভ করে, যাতে তাঁর হাতে ঈমানের দীক্ষা নিতে এবং বিগত অস্বীকৃতির ব্যাপারে তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু যখন হযরত ইউনুস (আ)-কে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন নিজেরা নিজেরাই একান্ত নির্মলচিত্তে, বিশুদ্ধ মনে তওবা-ইস্তেগফারের উদ্দেশ্যে জনপদ থেকে এক মাঠে বেরিয়ে গেল। সমস্ত নারী, শিশু এবং জীব-জন্তুকেও সে মাঠে এনে সমবেত করা হল। চটের কাপড় পরে অতি বিনয়ের সাথে সে মাঠে তওবা-ইস্তেগফার এবং আযাব থেকে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনায় এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে যায় যে, গোটা মাঠ আহাযারীতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দেন—যেমন এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ দিনটি ছিল আশুরা তথা ১০ই মহররমের দিন।

এদিকে হযরত ইউনুস (আ) বস্তির বাইরে এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, এখনই এই সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল হবে। তাদের তওবা-ইস্তেগফারের বিষয় তাঁর জানা ছিল না। কাজেই যখন আযাব খণ্ডে গেল, তখন তাঁর মনে চিন্তা হল যে, আমাকে (নির্ঘাৎ) মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ, আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, তিন দিনের মধ্যে আযাব এসে যাবে। এ সম্প্রদায়ে আইন প্রচলিত ছিল যে, যার মিথ্যা সম্পর্কে জানা যায় এবং সে যদি তার দাবির পক্ষে কোন সাফ-প্রমাণ পেশ করতে না পারে

তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। অতএব, হযরত ইউনুস (আ)-এর মনেও আশংকা দেখা দেয় যে, আমাকেও মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে হত্যা করে ফেলা হবে।

নবী-রসূলগণ যাবতীয় পাপ-তাপ থেকে মা'সুম হয়ে থাকেন সত্য, কিন্তু মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত বা পৃথক থাকেন না। সুতরাং তখন ইউনুস (আ)-এর মনে স্বভাবতই এই ভাবনা উপস্থিত হয় যে, আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশমতই ঘোষণা করেছিলাম, অথচ এখন আমি সে ঘোষণার কারণে মিথ্যুক প্রতিপন্ন হয়ে যাব! নিজের অবস্থানেই বা কোন্ মুখে ফিরে যাই এবং সম্প্রদায়ের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই দুঃখ-বেদনা ও পেরেশান অবস্থায় এ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন। রোম সাগরের তীরে পৌঁছে সেখানে একটি নৌকা দেখতে পান। তাতে লোক আরোহণ করছিল। ইউনুস (আ)-কে আরোহীরা চিনতে পারল এবং বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। নৌকা রওয়ানা হয়ে যখন মধ্য নদীতে গিয়ে পৌঁছাল, তখন হঠাৎ তা থেমে গেল; না সামনে যেতে পারছিল, না পিছনের দিকে ফিরে আসতে পারছিল। নৌকার আরোহীরা ঘোষণা করল যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের এই নৌকার এমনই গুণ যে, এতে যখনই কোন জালিম, পাপী কিংবা ফেরারী গোলাম আরোহণ করে, তখন এটি নিজে নিজেই থেমে যায়। কাজেই যে লোক এমন, তাকে তা প্রকাশ করে ফেলাই উচিত, যাতে একজনের জন্য সবার উপর বিপদ না আসে।

হযরত ইউনুস (আ) বলে উঠলেন, "আমি ফেরারী গোলাম, পাপীটি আমিই বটে।" কারণ, নিজের শহর থেকে পালিয়ে তাঁর নৌকায় আরোহণ করাটা ছিল একটি স্বভাব-জাত ভয়ের দরুন, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে নয়। এই বিনা অনুমতিতে এদিকে চলে আসাকে হযরত ইউনুস (আ)-এর পয়গম্বরসুলভ মর্যাদা একটি পাপ হিসাবেই গণ্য করল। কেননা, পয়গম্বরের কোন গতিবিধি আল্লাহ্‌র বিনা অনুমতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যই বললেন, আমাকে সাগরে ফেলে দিলে তোমরা সবাই এ বিপদ থেকে বেঁচে যাবে, কিন্তু নৌকার লোকেরা তাতে সম্মত হলো না, বরং তারা লটারী করল যে, লটা-রীতে যার নাম উঠবে, তাকেই সাগরে ফেলে দেয়া হবে। দৈবক্রমে লটারীতেও হযরত ইউনুস (আ)-এর নামই উঠল। সবাই এতে বিস্মিত হল। তখন কয়েকবার লটারী করা হল এবং সব কয়বারই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অনুযায়ী ইউনুস (আ)-এর নাম উঠতে থাকল। কোরআন করীমে এই লটারী এবং তাতে হযরত ইউনুস (আ)-এর নাম ওঠার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছেঃ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ-

ইউনুস (আ)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এ আচরণ ছিল তাঁর বিশেষ পয়গম্ব-রোচিত মর্যাদারই কারণ। যদিও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি যাকে পাপ বলে গণ্য করা যায় এবং কোন পয়গম্বরের দ্বারা তার সম্ভাবনাও নেই—কারণ, তারা হলেন মা'সুম তথা নিষ্পাপ, কিন্তু তা পয়গম্বরের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে এমনটি শোভন ছিল না যে, শুধুমাত্র স্বাভাবিক ভয়ের দরুন আল্লাহ্ তা'আলার

অনুমতি ছাড়াই কোথাও স্থানান্তরিত হবেন। এই মর্যাদাবহির্ভূত কাজের জন্য ভর্ৎসনা হিসাবেই এ আচরণ করা হয়েছে।

এদিকে লটারীতে নাম ওঠার ফলে সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল আর অপরদিকে একটি মহাকায় মাছ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে নৌকার কাছে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছিল, যাতে তিনি সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নিজের পেটে ঠাঁই করে দিতে পারে। তাঁকে পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ইউনুস (আ)-এর দেহ যা তোমার পেটের ভেতরে রাখা হবে, তা কিন্তু তোমার আহার্য নয়; বরং আমি তোমার পেটকে তার আবাস করছি। সুতরাং ইউনুস (আ) সাগরে পৌঁছার সাথে সাথে সে মাছ তাঁকে মুখে নিয়ে নিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) এ মাছের পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন। সে তাঁকে মাটির তলদেশ পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং বহু দূর-দূরান্তে নিয়ে বেড়াত। কোন কোন মনীষী সাত দিন, কেউ কেউ পাঁচ দিন আবার কেউ কেউ এক দিনের কয়েক ঘন্টাকাল মাছের পেটে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।—(মাযহারী)

তবে প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। এ অবস্থায় হযরত ইউনুস (আ) দোয়া করেন ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ইউনুস (আ)-কে সাগর তীরে ফেলে দেন।

মাছের পেটের উষ্ণতার দরুন তাঁর শরীরে কোন লোম ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছাকাছি একটি লাউ গাছ গজিয়ে দেন, যার পাতার ছায়া হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এক প্রশান্তি হয়ে যায়। আর এক বন্য ছাগলকে আল্লাহ্ ইশারা দিয়ে দেন, সে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত, আর তিনি তার দুধ পান করে নিতেন।

এভাবে হযরত ইউনুস (আ)-এর প্রতি তাঁর পদস্খলনের জন্য সতর্কীকরণ হয়ে যায়। আর পরে তাঁর সম্প্রদায়ও বিস্তারিত অবস্থা জানতে পারে।

এ কাহিনীতে যে অংশগুলো কোরআনে উল্লেখ রয়েছে কিংবা প্রামাণ্য হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো তো সন্দেহাতীতভাবে সত্য, কিন্তু বাকি অংশগুলো ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে গৃহীত, যার উপর শরীয়তের কোন মাস'আলার ভিত রাখা যায় না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ

النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا
بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

(৯৯) আর তোমার পরওয়ারদিগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসত সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য? (১০০) আর কারো ঈমান আনা হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুম হয়। পক্ষান্তরে তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না তাদের উপর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সেসব জাতি ও জনপদের কি বৈশিষ্ট্য) যদি আপনার পরওয়ারদিগার চাইতেন, তবে সমগ্র বিশ্ববাসী ঈমান নিয়ে আসত। (কিন্তু কোন কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তিনি তা চাননি। ফলে সবাই ঈমান আনেনি।) সুতরাং (ব্যাপারটি যখন এমন, তখন) আপনি কি লোকদেরকে জবরদস্তি করতে পারেন, যার ফলে তারা ঈমান নিয়ে আসবে? অথচ কারো ঈমান আনা আল্লাহ্‌র হুকুম (তথা তাঁর ইচ্ছা) ছাড়া সম্ভব নয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা আরোপ করে দেন।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَ
النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ
اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ
مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا
نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

(১০১) তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমূহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতি প্রদর্শনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না। (১০২) সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেসব দিনের মতই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন, এখন পথ দেখ; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম। (১০৩) অতপর আমি বাঁচিয়ে

নেই নিজের রসূলগণকে এবং তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এমনিভাবে। ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, তোমরা লক্ষ্য কর (এবং দেখ,) কি কি বস্তু রয়েছে আসমান ও যমীনে। (আকাশের তারকারাজি প্রভৃতি এবং যমীনের অসংখ্য সৃষ্টি দেখ অর্থাৎ তা লক্ষ্য করলে তওহীদ তথা একত্ববাদের যৌক্তিক দলীল পাওয়া যাবে। এই হল তাদের মুকাল্লাফ হওয়ার বর্ণনা।) আর যারা (ঈর্ষাবশত) ঈমান আনে না, তাদের জন্য যুক্তি-প্রমাণ এবং তাম্বিতাকীদে কোন লাভ হবে না (এই হল তাদের ঈর্ষার বর্ণনা)। কাজেই (তাদের এই ঈর্ষাপূর্ণ অবস্থায় এমন প্রতীয়মান হয় যে,) তারা (অবস্থানুযায়ী) শুধুমাত্র তাদেরই অনুরূপ ঘটনার অপেক্ষা করছিল যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। (অর্থাৎ দলীল-প্রামাণ ও ভৎর্সনা সত্ত্বেও যারা ঈমান আনেনি, তাদের অবস্থা সে লোকেরই অনুরূপ, যারা এমন আযাবের অপেক্ষায় থাকে যা বিগত কোন উম্মতের উপর এসে গিয়েছিল। সুতরাং) আপনি বলে দিন, তাহলে তাই হোক, তোমরা (এরই) অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে (এর) অপেক্ষায় থাকলাম। (অতীতে যেসব সম্প্রদায়ের উপর আযাব আগমনের কথা উল্লেখ ছিল, তাদের উপর আযাব আরোপ করতামই) অতপর আমি (এ আযাব হতে) স্বীয় পয়গম্বর এবং ঈমানদারগণকে বাঁচিয়ে রাখতাম। (যেমন করে নাজাত দিয়েছিলাম সে সমস্ত মু'মিনকে) তেমনি করে আমি সমস্ত মু'মিনকে নাজাত দান করে থাকি। (প্রতিশ্রুতি মুতাবিক) এটি হল আমার দায়িত্ব। (অতএব, এভাবে যদি এসব কাফিরের উপর কোন বিপদ নাযিল হয়, তাহলে মুসলমানগণ তা থেকে হিফাযতে থাকবে, তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা আখিরাতে)।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ
الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ
يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا
تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ
فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ
بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

(১০৪) বলে দাও—হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাক, তবে (জেনো) আমি তাদের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর আল্লাহ্ ব্যতীত। কিন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি তুলে নেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (১০৫) আর যেন সোজা দীনের প্রতি মুখ করি সরল হয়ে এবং যেন মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত না হই। (১০৬) আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (১০৭) আর আল্লাহ্ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদের) বলে দিন, হে মানবকুল, তোমরা যদি আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহে (ও দ্বন্দ্বে) থেকে থাক তবে (আমি তোমাদেরকে এর তাৎপর্য বলে দিচ্ছি —তা হল এই যে,) আমি সেসব উপাস্যের ইবাদত করি না আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে, তোমরা যাদের ইবাদত কর। তবে অবশ্য আমি সে উপাস্যের ইবাদত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন। আর (আল্লাহ্র তরফ থেকে) আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যেন আমি (এমন উপাস্যের উপর) ঈমান গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি এবং (আমার উপর) এই (নির্দেশ হয়েছে) যেন আমি নিজে দীন (অর্থাৎ উল্লিখিত বিশুদ্ধ তওহীদ)-এর প্রতি এমনভাবে মনোনিবেশ করি যাতে অন্যান্য মতবাদ থেকে আলাদা হয়ে যাই এবং কখনও যেন মুশরিক না হই। আর (এ নির্দেশ হয়েছে যে,) আল্লাহ্ (তা'আলার একত্ববাদ)-কে পরিহার করে এমন বস্তুর ইবাদত করবে না, যা তোমাকে না (ইবাদত করার প্রেক্ষিতে) কোন উপকার করতে পারে আর না (ইবাদত পরিহার করার প্রেক্ষিতে) কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। অতপর যদি (ধরে নেওয়া হয়) এমন কর (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত কর,) তাহলে এমতাবস্থায় (আল্লাহ্ তা'আলার) হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে এবং (আমাকে একথা বলা হয়েছে যে,) যদি (তোমার উপর) আল্লাহ্ তা'আলা কোন কষ্ট আরোপ করেন, তবে শুধুমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ তা সরাবার মত নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন সুখ দান করতে চান তবে তাঁর অনুগ্রহকে সরাবার মতও কেউ নেই। (বরং) তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ থেকে যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন। তিনি মহান ক্ষমাশীল, করুণাময় (বস্তুত অনুগ্রহের সমস্ত প্রকারই মাগফিরাত ও রহমতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তিনি যেহেতু মাগফিরাত ও রহমতের গুণে গুণান্বিত, কাজেই তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবেই অনুগ্রহশীলও বটেন)।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى
فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ
اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝١٠٨ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى
يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝١٠٩

(১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (একথাও) বলে দিন যে, হে মানবকুল, তোমাদের নিকট তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে (প্রমাণাদিসহ) সত্য (দীন) এসে পৌঁছে গেছে। অতএব, (এর আগমনের পর) যে লোক সরল পথে এসে যাবে, সে তার নিজের লাভের জন্যই সরল পথে আসবে, আর যে লোক (এখনও) বিপদে থাকবে, তার (এই) বিপথ-গামিতা (অর্থাৎ এর অনিষ্টও) তারই উপর পতিত হবে। তাছাড়া আমাকে তোমাদের উপর (দায়ী হিসাবে) চাপিয়ে দেওয়া হয়নি (যে, তোমাদের বিপথগামিতার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং এতে আমার কি ক্ষতি?) আর আপনি তারই অনু-সরণ করতে থাকুন যা কিছু আপনার প্রতি ওহী করা হয়। (এতে অন্যান্য আমলের সাথে সাথে তবলীগের বিষয়টিও এসে গেছে।) আর (তাদের কুফরী ও দুঃখ দানের ব্যাপারে) সবর করুন যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা (সে সবের) মীমাংসা করে দেন। (তা দুনিয়াতে ধ্বংসের সম্মুখীন করেই হোক কিংবা আখিরাতে আযাব দানের মাধ্যমেই হোক। আপনি আপনার ব্যক্তিগত ও পদগত কাজে নিয়োজিত থাকুন; তাদের ব্যাপারে ভাববেন না।) বস্তুত তিনিই হচ্ছেন মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম (মীমাংসাকারী)।

سورة هود

সূরা হূদ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১২৩, রুকূ ১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ﴿۱﴾
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ﴿۲﴾ وَّاَنِ
اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿۳﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا
مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا
يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۵﴾

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ, লা-ম, রা; এ এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। (২) যেন তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তারই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশি করে দেবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে

যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহ্‌র নিকট হতে লুকাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানে না যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ, লা---ম, রা (এর সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা জানেন)। এটি (অর্থাৎ কোরআন পাক) এমন এক বিস্ময়কর কিতাব, যার আয়াতসমূহ (অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে) সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অতপর সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনাও করা হয়েছে। এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার (অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলার) পক্ষ হতে (এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে)। যার প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত-উপাসনা করবে না; (হে রসূল, আপনি বলুন-- নিশ্চয়) আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে (ঈমান না আনার কারণে আযাব সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী, আর ঈমান আনার জন্য পুরস্কারের সুখবর দাতা। আর (এ গ্রন্থের আরো একটি অন্যতম উদ্দেশ্য) এই যে, তোমরা যেন নিজেদের (শিরক, কুফরী প্রভৃতি) পাপ হতে তোমাদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন কর এবং) অতপর তাঁরই প্রতি (উপাসনার মাধ্যমে) মনোনিবেশ কর। (অর্থাৎ সর্বদা সৎকার্য করতে থাক। তাহলে ঈমান ও সৎকার্যের দৌলতে) তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা (অর্থাৎ মৃত্যুকাল) পর্যন্ত (পার্থিব জীবনে) উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন। আর অধিক সৎকর্মশীলকে অধিকতর প্রতিদান দেবেন। (একথাও সুখবর দানকারী হিসাবে বলা হয়েছে।) পক্ষান্তরে তোমরা যদি (ঈমান আনয়ন করা হতে) বিমুখ হয়ে থাক, তাহলে (এমতাবস্থায়) আমি তোমাদের উপর এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কাবোধ করছি। (এ সংবাদ সতর্ককারী হিসাবে বলা হয়েছে।) আর আল্লাহ্‌র আযাবকে সুদূর পরাহত মনে করো না। কারণ, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আর তিনি তো সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। [অতএব, তাঁর আযাবকে দূরে মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অবশ্য যদি তাঁর সান্নিধ্যে তোমাদের উপস্থিত হতে না হত অথবা (নাঊযুবিল্লাহ্) তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান না হতেন, তাহলে হয়ত আযাব না হতে পারত। কাজেই ঈমান ও একত্ববাদ হতে বিমুখ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও ইলমই তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।] জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা নিজেদের বুকে বুক মিলিয়ে নেয়, আর উপরে কাপড় জড়িয়ে নেয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নিজেদের মনোভাব ও দুরভিসন্ধি লুকাতে পারে; অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলার সময় অতি সংগোপনে, চুপিসারে রেখে-ঢেকে কথা বলে। যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন, এবং যারা আপনার প্রতি যে ওহী হয় তা বিশ্বাস করে, তারা এমনটি

করবে না। কারণ, এহেন অপকৌশলের আশ্রয় নেয়া বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ হতে গোপন করার অপচেষ্টারই শামিল। জেনে রাখ, তারা যখন বুকে বুক মিলিয়ে নিজেদের কাপড় (নিজেদের উপর জড়িয়ে নেয়) তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবকিছু জানেন, যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। (কেননা) নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা কিছু কল্পনা বা মনোভাব মানুষের অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে (সুতরাং মুখে উচ্চারিত কথাবার্তা কেন তাঁর জানা থাকবে না?)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদ ঐসব সূরার অন্যতম, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহ্র গযব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একদিন হযরত রসূলে করীম (সা)-এর কিছু দাড়ি-মুবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন—'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।' তখন রসূলে পাক (সা) ইরশাদ করেছিলেন, "হ্যাঁ, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হুদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। —(আল-হাকেম ও তিরমিযী শরীফ)। উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

অত্র সূরার প্রথম আয়াত 'আলিফ লাম-রা' বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকেই এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। محكم শব্দ حكم হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন ভুল বা বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াত-সমূহকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।—(তফসীরে কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন এখানে "محكم" শব্দ منسوخ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে—আল্লাহ্

তা'আলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিত-রূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পবিত্র কোরআন নাযিলের ফলে যেভাবে 'মনসূখ' বা রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাযিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না।---(কুরতুবী) তবে কোরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কোরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تفصيل শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সেজন্যেই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فصل، فصل শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়িদ, ইবাদত, আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফুযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কার্যে বহু রহস্য ও হিকমত বিদ্যমান---যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাযিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতেই তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যতকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইলম ও হিকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তওহীদের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও

গুরুত্বপর্ণ বিষয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-উপাসনা করবে না।

অতপর ইরশাদ করেছেন ঃ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশ্বনবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দো-জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখিরাতে অফুরন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نذير শব্দের অর্থ করা হয়, 'ভীতি প্রদর্শনকারী'। কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্র জন্তু বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং এমন ব্যক্তিকে 'নাযীর' বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমন সব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখিরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

তৃতীয় আয়াতে কোরআন হিদায়তসমূহের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিদায়ত এভাবে দেয়া হয়েছে—وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ অর্থাৎ মুহকাম আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে এ পথনির্দেশ দিয়েছেন যে, "তারা যেন স্বীয় পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে।" ক্ষমার সম্পর্ক পূর্বকৃত গোনাহ্সমূহের সাথে আর তওবার সম্পর্ক ভবিষ্যতে পুনরায় তার কাছেও না যাওয়ার অঙ্গীকারের সাথে। অতএব পূর্বকৃত গোনাহ্র জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আগামীতে পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাই হলো সত্যিকার তওবা। এজন্যই কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, ভবিষ্যতে গোনাহ্ হতে বিরত থাকার সংকল্প ছাড়া মৌখিক তওবা করা হল توبة الكذابين (অর্থাৎ) মিথ্যাবাদী-দের তওবা।—(কুরতুবী)। অনুরূপভাবে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ معصيت را خندہ می آید ز استغفار ما অর্থাৎ আমাদের তওবা দেখে খোদ গোনাহরও হাসি পায়। অন্য কথায় এ ধরনের তওবা হতে তওবা করা উচিত।

অতপর সত্যিকার তওবাকারীদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى বলে।

অর্থাৎ যারা পূর্বকৃত গোনাহ হতে সত্যিকারভাবে তওবা করে, ভবিষ্যতে তাতে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও সতর্কতা অবলম্বন করে, তাদের শুধু ক্ষমাই করা হয় না, বরং তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবন দান করা হবে। পার্থিব নশ্বর জীবন ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন উভয়ই অত্র সুসংবাদের আওতাভুক্ত। যেমন অন্য এক আয়াতে এরূপ তওবাকারী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً অর্থাৎ আমি অবশ্যই তাকে সুখময় জীবন দান করব।" অত্র আয়াত সম্পর্কেও অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এখানে ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ই শামিল রয়েছে। সূরা নূহে তওবাকারীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে রহমত বর্ষণ করবেন। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের মদদ করবেন এবং তোমাদেরকে বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দান করবেন। এখানে রহমত বর্ষণ, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা পার্থিব নিয়ামতসমূহ বোঝানো হয়েছে এবং বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দ্বারা আখিরাতের নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে مَتَاعًا حَسَنًا শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে অধিকাংশ মুফাসসির বলেন—ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবার ফলশ্রুতিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিযিকের সচ্ছলতা ও প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সহজলভ্য করে দেবেন, সর্বপ্রকার আযাব ও অনিষ্ট হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। তবে পার্থিব জীবন যেহেতু একদিন শেষ হয়ে যাবে, কাজেই এর সুখ-শান্তিও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ইহজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বজায় থাকবে। অতপর মৃত্যু এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই আখিরাতের অন্তহীন জীবন শুরু হবে। তওবাকারীদের জন্য সেখানেও অফুরন্ত আরাম-আয়েশের বিপুল আয়োজন রাখা হয়েছে।

হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, এখানে مَتَاعًا حَسَنًا দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টির দিক থেকে সরে স্রষ্টার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া। কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ متاع حسن- অর্থ হচ্ছে, যা আছে তার উপর তুষ্ট থাকা আর যা খোয়া গেছে তার জন্য বিষণ্ণ না হওয়া। অর্থাৎ বৈষয়িক সামগ্রী বৈধভাবে যতটুকু অর্জিত হয় তাতে সন্তুষ্ট থাকা আর যা অর্জিত নয় সেজন্য পেরেশান না হওয়া।

ইস্তেগফার ও তওবাকারীদের জন্য দ্বিতীয় খোশখবরী শোনানো হয়েছে ঃ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ এখানে প্রথম فضل দ্বারা মানুষের নেক আমল এবং দ্বিতীয় فضل দ্বারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অর্থাৎ বেহেশত বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অত্র আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার সৎকর্ম অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস দান করবেন।

প্রথম বাক্যে পার্থিব ও পারলৌকিক—উভয় জীবনে সুখ-সচ্ছলতার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে আখিরাতের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ অর্থাৎ এতসব নীতিবাক্য ও হিতোপদেশ সত্ত্বেও যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বকৃত গোনাহ্ হতে ক্ষমা প্রার্থনা না কর এবং ভবিষ্যতে তা হতে বিরত থাকতে বদ্ধপরিকর না হও, তাহলে আমার ভয় হয় যে, এক মহাদিনের আযাব এসে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে মহাদিন বলে কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, ব্যক্তির দিক দিয়ে সে দিনটি হবে হাজার বছরের সমান। আর সংকট ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে তার চেয়ে বড় কোন দিন নেই।

পঞ্চম আয়াতেও পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর উপর আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনে তোমরা যা কিছু কর আর যেভাবেই জীবন-যাপন কর না কেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সর্বশক্তিমান, তার জন্য কোন কার্যই দুঃসাধ্য বা দুষ্কর নয়। তোমাদের মৃত্যু এবং মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তোমাদের সমস্ত অণুকণাসমূহ একত্র করে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় মানুষরূপে দাঁড় করাতে সক্ষম।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও বদভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা রসূলে পাক (সা)-এর সাথে তাদের বৈরিতা ও বিদ্বেষকে গোপন রাখার ব্যর্থ-প্রয়াসে লিপ্ত। তাদের অন্তরস্থ হিংসা ও কুটিলতার আগুনকে ছাইচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, বুকের উপর চাদর আচ্ছাদিত করে রাখলে এবং চুপে চুপে চক্রান্ত করলে তাদের কুটিল মনোভাব ও দুরভিসন্ধির কথা কেউ জানতে বা আঁচ করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ ও সলা পরামর্শ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন। কেননা, إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি তো অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত গুপ্ত ভেদের কথাও পূর্ণ ওয়াকিফহাল, কোন সন্দেহ নেই।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن
بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝
وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا
يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم
مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

(৬) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (৭) তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে; তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন কাফিররা অবশ্য বলে, "এটা তো স্পষ্ট যাদু।" (৮) আর যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে---কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে রাখ, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়; তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর পৃথিবীতে বিচরণশীল (আহার্য-পানীয় ইত্যাদি জীবিকার মুখাপেক্ষী) প্রাণ নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নেননি। (রিযিক পৌঁছানোর জন্য ইলম থাকা অপরিহার্য। তাই) প্রত্যেকের অধিককাল অবস্থানের জায়গা এবং স্বল্পকাল অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে তিনি অবগত (এবং সবাইকে সেখানেই রিযিক পৌঁছে দেন।) আর যদিও সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার ইলমে রয়েছে, সাথে সাথে এক সুবিন্যস্ত কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুজে) লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত রয়েছে। (অতপর সৃষ্টির রহস্য বলা

হচ্ছে, যা দ্বারা কিয়ামতে পুনরায় সৃষ্টি করা সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়। কেননা, প্রথমবার নজীরবিহীনভাবে তিনি যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তখন দ্বিতীয়বারও অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারবেন।) আর তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) এমন এক মহান সত্তা যিনি মাত্র ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমাণ সময়ে আকাশ ও ভূমণ্ডলকে) সৃষ্টি করেছেন। তখন পানির উপর তাঁরই আরশ ছিল। (যেন এ দু'টি পূর্ব থেকেই সৃষ্ট ছিল। আর এই নবসৃষ্টি ছিল এ কারণে) যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। (অর্থাৎ তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তার মাধ্যমে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রেখেছেন যেন তোমরা তা অবলোকন করে আল্লাহ্র একত্ববাদকে উপলব্ধি করতে পার এবং তাতে তা দ্বারা উপকৃত হয়ে নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর) এবং তাঁর আনুগত্য ও খিদমত কর, (অর্থাৎ বেশি বেশি নেক আমল কর।) কিন্তু কেউ সৎকার্য করল, আর কেউ তা করল না। আর আপনি যদি (লোকদেরকে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, তখন (তাদের মধ্যে) যারা অবিশ্বাসী তারা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, 'এটি তো স্পষ্ট যাদু।' [কোরআনকে যাদু বলার কারণ এই যে, যাদু যেমন ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াশীল, তদ্রূপ কোরআন পাককেও তারা ভিত্তিহীন মনে করত (নাউযুবিল্লাহ), কিন্তু এর আয়াতসমূহের ক্রিয়াশীলতা তারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল। তাই উভয় দিক বিবেচনা করে তারা কোরআনকে যাদু বলে অভিহিত করেছে। তাই সামনে তার জবাব দেয়া হচ্ছে—] আর কতিপয় হিকমত ও বিশেষ রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত (অর্থাৎ পার্থিব জীবনে) সাময়িকভাবে তাদের থেকে প্রতিশ্রুত আযাবকে স্থগিত রাখি, তবে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, আপনার কথা মতে (আমরা যখন শাস্তিযোগ্য অপরাধী তবে) এখন শাস্তি হচ্ছে না কেন? কোন্ জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? (অর্থাৎ সত্যিই যদি আযাব থাকত, তাহলে এতদিনে অবশ্যই আপতিত হত। তা যখন অদ্যাবধি হচ্ছে না, কাজেই ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা জবাব দিচ্ছেন —) শুনে রাখ, যেদিন নির্ধারিত সময়ে তাদের উপর তা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত আযাব) এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়। (কেউ বাধা দিয়ে তার গতি রোধ করতে পারবে না। বরং) তারা যে আযাব সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, সে আযাবই তাদের ঘেরাও করবে। (অর্থাৎ রহস্যগত কতিপয় বিশেষ কারণে আযাব আসার জন্য সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। অতপর যথাসময়ে আযাব যখন আসবে, তখন কেউই রেহাই পাবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ইলমের ব্যাপকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং মানুষের মনের গোপন কল্পনাও তাঁর অজানা নয়। অতপর তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে

মানুষের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের আহার্য-পানীয় ইত্যাদি রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। শুধু মানুষেরই নয়, পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী যেখানেই অবস্থান করুক বা চলে যাক না কেন, সেখানেই তার রিযিক পৌঁছতে থাকবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র নিকট হতে কিছু গোপন করার জন্য কাফিরদের অপকৌশল ও ব্যর্থপ্রয়াস বোকামি এবং মূর্খতা বৈ নয়।

এখানে مِنْ শব্দ বৃদ্ধি করে وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ বলে আয়াতের ব্যাপকতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, অন্য হিংস্র জন্তু, পক্ষীকুল, গুহাবাসী সরীসৃপ, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, সামুদ্রিক প্রাণী প্রভৃতি সবই অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত। সকলের রিযিকের দায়িত্বই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

دَآبَّةٌ (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে, যা পৃথিবীতে বিচরণ করে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা, সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যার দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ করেছেন ঃ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'উহাদের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত।' একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর ইহা এক পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যা নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে عَلَى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে---যা ফরয বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহ্র উপর কোন কাজ ফরয বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رِزْق রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোন প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যা দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিযিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিযিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা উহার মালিক হয় না। কারণ, মালিক হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। অনুরূপ-ভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিযিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কিরাম বলেন, রিযিক হালালও হতে পারে হারামও হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের

বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক বৈধ পন্থায়ই তার নিকট পৌঁছে যেত।

রিযিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথা নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়! এর রহস্য কি? ওলামায়ে কিরাম এ প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন।

তন্মধ্যে এক জবাব হচ্ছে, এখানে রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণেই মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেওয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতপর রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবূ মূসা (রা) ও হযরত আবূ মালেক (রা) প্রমুখ আশ'আরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথেয়-স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সা)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন, রসূলে করীম (সা) তাদের জন্য কোন আহার্যের সুব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রসূলে আকরাম (সা)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রসূলে পাক (সা)-এর কোরআন তিলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এল ঃ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেন নি (উক্ত সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন---"শুভ-

সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে।" তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রসূলে পাক (সা)-কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চিত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি قَصْعَة অর্থাৎ বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশ'আরীদের দান করল। অতপর দেখা গেল আশ'আরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সমীপে প্রেরণ করা বান্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা খাঞ্চা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলছেন---"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার প্রেরিত রুটি-গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তো কোন খানা প্রেরণ করিনি।"

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন---"আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা তা প্রেরণ করেছেন ---যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত মূসা (আ) আগুনের খোঁজে তূর পাহাড়ে পৌঁছে আগুনের পরিবর্তে যখন সেখানে আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লী দেখতে পেলেন, নবুয়ত ও রিসালত লাভ করলেন এবং ফিরাউন ও তার কওমকে হিদায়তের জন্য মিসর গমনের নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁর মনের কোণে উদয় হল যে, আমি স্বীয় স্ত্রীকে জনহীন-মরুপ্রান্তরে একাকিনী রেখে এসেছি, তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-র সন্দেহ নিরসনের জন্য আদেশ করলেন যে, "তোমার সম্মুখে পতিত প্রস্তরখানির উপর লাঠি দ্বারা আঘাত হান।" তিনি আঘাত করলেন। তখন উক্ত প্রস্তরখানি বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্য হতে আরেকখানি পাথর বের হল। দ্বিতীয় প্রস্তরখানির উপর আঘাত করার জন্য পুনরায় আদেশ হল। হযরত মূসা (আ) আদেশ পালন করলেন। তখন তা ফেটে গিয়ে আরেকখানি প্রস্তর বের হল। তৃতীয় পাথরখানির উপর আঘাত হানার জন্য আবার নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি আঘাত করলেন। তা বিদীর্ণ হল এবং এর অভ্যন্তর হতে একটি জ্যান্ত কীট বেরিয়ে এল, যার মুখে ছিল একটি তরু-তাজা তৃণখণ্ড (সুবহানাল্লাহ্)। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের একীন হযরত মূসা (আ)-র পূর্বেও ছিল। তবে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। তাই এ দৃশ্য দেখার পর হযরত মূসা (আ) সরাসরি মিসর পানে রওয়ানা হলেন।

সহধর্মিণীকে এটা বলা প্রয়োজন মনে করেননি যে, মিসর যাওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিযিক পৌঁছাবার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ঃ অত্র আয়াতে "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন"—বলেই ক্ষান্ত হন নি। বরং মানুষকে আরো নিশ্চয়তা দান করার জন্য ইরশাদ করেছেন ঃ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا আলোচ্য আয়াতে مستقر 'মুস্তাকার' ও مستودع 'মুস্তাওদা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কাশশাফের ব্যাখ্যাই অধিক অভিধানসম্মত। তা হচ্ছে, 'মুস্তাকার' স্থায়ী বাসস্থান বা বাসভূমিকে বলে। আর অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানস্থলকে 'মুস্তাওদা' বলা হয়।

সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মাদারীকে দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা শক্তির দায়িত্বের সাথে তুলনা করা চলে না। কারণ, দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার যদি আপনার খোরাকীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলেও কিছুটা পরিশ্রম আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থান হতে আপনি যদি স্থানান্তরিত হতে চান, তবে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে যে, অমুক মাসের অত তারিখ হতে অত তারিখ পর্যন্ত আমি অমুক শহরে বা গ্রামে অবস্থান করব। অতএব, আমার খোরাকী সেখানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হোক। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যিম্মাদারী গ্রহণ করলে এতটুকু মেহনতও করা লাগে না। কেননা তিনি তো সকল প্রাণীর প্রতিটি নড়াচড়া, উঠা-বসা, চলাফেরা সম্পর্কে সম্যক অবহিত তিনি যেমন আপনার স্থায়ী নিবাস জানেন, তেমনি সাময়িক আবাসও জ্ঞাত আছেন। কাজেই কোন আবেদন অনুরোধ ছাড়াই আপনার রেশন যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবেই।

আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাত্মক ইলম ও সর্বময় ক্ষমতার ফলে যাবতীয় কাজ সমাধার জন্য তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। কোন কিতাব বা রেজিস্টারে লেখা-লেখির আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানুষ যে ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে রিযিক পৌঁছাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মনের খটকা দূর করে তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্য ইরশাদ করেছেন ঃ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ সবকিছুই এক খোলা কিতাবে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। 'এখানে' 'খোলা কিতাব' বলে 'লওহে মাহ্ফূয'কে বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্ট জীবের আয়ু, রুযী ও ভালমন্দ কার্যকলাপ পুংখানুপুংখরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা যথাসময়ে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ ফরমান—আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের তাকদীর নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন।—(মুসলিম শরীফ)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একখানি দীর্ঘ হাদীস বয়ান করেন যার সারমর্ম হল—মানুষ তার জন্মের পূর্বে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আসে। মাতৃগর্ভে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক একজন ফেরেশতা তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম, ভালমন্দ তার যাবতীয় কার্যকলাপ, যা সে জীবনভর করবে। দ্বিতীয়, তার আয়ুষ্কালের বর্ষ, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট ও শ্বাস-প্রশ্বাস। তৃতীয়, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কোথায় সমাধিস্থ হবে। চতুর্থ, তার রিযিক কি পরিমাণ হবে এবং কোন্ পথে তার কাছে পৌঁছবে। সুতরাং লওহে মাহফূযে আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকা অত্র রেওয়ায়েতের বিপরীত নয়।

সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম ইলম ও অসীম শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি মাত্র ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সমগ্র আসমান ও যমীন সৃজন করেছেন। আর এসব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্র আরশ পানির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। এতদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বেই পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সূরা হা-মীম-সাজদার দশম ও একাদশ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে, দুই দিনে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা এবং প্রাণীকুলের আহার্য ও জীবন ধারণের উপকরণাদি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, এখানে আসমান দ্বারা সমগ্র উর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে এবং যমীন দ্বারা সমস্ত নিম্নজগত বোঝানো হয়েছে। আসমান ও যমীন সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু সূর্যও ছিল না, তার উদয়-অস্তও ছিল না, সুতরাং দিনের অস্তিত্বও ছিল না। তবে এখানে 'দিন' বলে আসমান ও যমীন সৃষ্টির পরবর্তী 'একদিন পরিমাণ' সময়কে বোঝানো হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা এক মুহূর্তে সবকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা করেননি। বরং স্বীয় হিকমতের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে সৃজন করেছেন, যেন তা মানুষের প্রকৃতিসম্মত হয় এবং মানুষও সকল কাজে ধীরতা, স্থিরতা অবলম্বন করে।

আয়াতের শেষভাগে আসমান ও যমীন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا সবকিছু সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করতে চাই যে, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল।

এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমলকারী মানুষের উপকারার্থে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তারা এর মাধ্যমে

নিজেদের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং এর অপার রহস্য চিন্তা করে নিজেদের প্রকৃত মালিক ও পালনকর্তাকে চিনতে পারে।

সারকথা, আসমান ও যমীন সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে মানুষ। বরং মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং তাদের মধ্যে আবার যারা অধিক সৎকর্মশীল তাদের খাতি-রেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী (সা)-ই সর্বাধিক সৎকর্মশীল ব্যক্তি। অতএব, একথা নির্ঘাত সত্য যে, হযরত রসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র সত্তাই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মূল কারণ। —(তফসীরে মাযহারী)

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে أَحْسَنُ عَمَلًا -কে সবচেয়ে ভাল কাজ বলা হয়েছে, কিন্তু কে সর্বাধিক কাজ করে বলা হয়নি। অতএব, বোঝা যায় যে, নামায-রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ইত্যাদি যাবতীয় নেক কাজ সংখ্যায় খুব বেশি করার চেয়ে, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আমল করাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমলের এই সৌন্দর্যকে হাদীস শরীফে ইহ্সান বলা হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমল করতে হবে। পার্থিব কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য জড়িত করবে না। আল্লাহ্র পছন্দনীয় পদ্ধতিতে আমল করতে হবে, যেভাবে মহানবী (সা) নিজে করে দেখিয়েছেন। আর তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা, সুন্নত তরীকা মুতাবিক ইখলাসের সাথে অল্প আমল করাও ঐ অধিক আমলের চেয়ে উত্তম যার মধ্যে উপরোক্ত গুণ দু'টি নেই অথবা কম আছে।

সপ্তম আয়াতে কিয়ামত ও আখিরাতকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের যে কথা বোধগম্য না হয় তাকেই তারা 'যাদু' বলে অভিহিত করে এড়িয়ে যেতে চায়।

অষ্টম আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে, যারা আযাবের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও নবীদের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করত না; বরং বলত যে, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছেন, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে সে আযাব কেন আপতিত হচ্ছে না?

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ
كَفُورٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ
بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ
عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ
مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ
وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

(৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতপর উহা তার থেকে ছিনিয়ে নেই; তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। (১০) আর যদি তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং সৎকার্য করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২) আর সম্ভবত ঐসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট্ট করে বসবে? তাদের এ কথায় যে, তার উপর কোন ধনভাণ্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমি তো শুধু সতর্ক-কারী মাত্র; আর সব কিছুর দায়িত্বভারই তো আল্লাহ্ নিয়েছেন। (১৩) তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরি করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে আস; এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) অতপর তারা যদি তোমাদের কথা পূরণ করতে অপারক হয়; তবে জেনে রাখ ইহা আল্লাহ্র ইলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একীন করে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। অতএব, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতপর তার থেকে উহা ছিনিয়ে নেই, তাহলে সে হতাশ হয়ে পড়ে ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি

তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পর তাকে সুখ-ভোগ করতে দেই, তবে সে (গর্ব করে) বলতে থাকে যে, আমার সমস্ত অমঙ্গল চিরতরে দূর হয়ে গেছে (আর কোন দুঃখকষ্ট হবে না)। অতপর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহংকারে উদ্ধত হয়। কিন্তু যারা ধৈর্য-ধারণকারী ও সৎকর্মশীল (অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি) তাদের অবস্থা এমন নয়। (বরং তারা বিপদের সময় ধৈর্যধারণ এবং সুখের সময় শুক্‌রিয়া আদায় করে। অতএব,) তাদের জন্য ব্যাপক ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (সারকথা, ঈমানদার ব্যতীত অধিকাংশ লোকের অবস্থা হল যে, তারা যেমন অল্পতেই নির্ভীক হয়ে যায়, তেমনি সামান্যতেই হতাশ হয়ে পড়ে। তাই আযাব বিলম্বিত হতে দেখে তারা নির্ভীক ও অমান্যকারী হয়ে পড়ে। আর তাদের অস্বীকার ও বিদ্রূপের কারণে) আপনি কি ঐসব আহকামের কিছু অংশ (অর্থাৎ তবলীগ করা) ছেড়ে দিতে চান যা ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করা হয়। ইহা সুস্পষ্ট যে, তবলীগের কাজ ছেড়ে দেওয়া আপনার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই তাদের একথায় আপনার মন ছোট করায় লাভ কি? যে, ইনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কাছে কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসে না কেন? (যিনি আমাদের সাথেও কথাবার্তা বলবেন। এ ধরনের কোন প্রকাশ্য মু'জিযা দেখান না কেন? যা হোক, তাদের এহেন অবাস্তব কথায় আপনি হতোদ্যম হবেন না। কেননা,) আপনি তো (কাফিরদের জন্য) শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী (অর্থাৎ পয়গম্বর মাত্র। মু'জিযা দেখানো নবীর কোন জরুরী দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়।) আর সবকিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, আপনি নন। কাজেই মু'জিযা প্রদর্শন করা আপনার ইখতিয়ার বহির্ভূত। অতএব, এই ধরনের চিন্তা বা এর ফলে সংকুচিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অবশ্য পয়গম্বরগণের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ সাধারণত কোন মু'জিযা থাকা আবশ্যক। আর আপনার প্রধান মু'জিযা 'আল-কোরআন' তাদের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কোরআন পাককে অমান্য করার হেতু কি? কোরআন সম্পর্কে তারা কি বলতে চায়? উহা আপনি নিজের পক্ষ হতে তৈরি করেছেন? (نعوذ بالله) তদুত্তরে আপনি বলুন—এ যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে আস। আর তোমাদের সহযোগিতার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাকে যাকে পার, ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। অতপর তারা যদি তোমাদের অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কথা অর্থাৎ কোরআনের অনুরূপ সূরাসমূহ রচনার দাবি পূরণে অপারক হয়, তখন তোমরা তাদেরকে বল যে, এখন বিশ্বাস কর, এই কিতাব আল্লাহ্‌র ইল্‌ম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কারো ইল্‌ম ও কুদরতের কোন দখল নেই। আর এও একীন করে নাও যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। কেননা, মা'বুদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি থাকা অপরিহার্য। অন্য কোন মা'বুদ থাকলে সেও সর্বশক্তিমান হত। উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তোমাদের সাহায্য করত। ফলে তোমাদের পক্ষে কোরআনের সমতুল্য কোন সূরা রচনা করতে অপারক হওয়ার তওহীদ